কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

নতুন পুকুরের জাগ্রত দৈত্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM ★2022★

নতুন পুকুরের জাগ্রত দৈত্য

কেয়া গাছের ঝোঁপের পাশে পর-পর দুদিন দুটো মোটা-মোটা সাপ দেখে বড়মামা ঠিক করলেন, সবকটা কেয়া গাছই কেটে ফেলবেন। কেয়া ফুল যখন ফোটে, দেখতে সুন্দর লাগে, গন্ধও খুব মিষ্টি। কিন্তু ওই গন্ধে নাকি সাপ আসে।

সাপ দেখলে তো ভয় হবেই।

কাছেই মিলি, বুবুন, টুকুনরা খেলা করে। এক-একদিন খেলতে খেলতে সন্ধে হয়ে যায়। ওরা অবশ্য একদিনও সাপ দেখেনি।

বড়মামা দেখেছেন, শুধু তাই নয়, একটা সাপ তাঁর দিকে ফণা তুলে ফেস করেছিল। তাই তিনি লোক ডাকিয়ে সবকটা কেয়া গাছ তো কেটে ফেললেনই, আশেপাশের ঝোঁপ-ঝাড় সব পরিষ্কার করালেন। দেখা গেল, সেখানে দুটো বড়-বড় গর্ত। ওই গর্তেই নিশ্চয়ই সাপেদের বাসা। তা হলে তো সাপ দুটোকে বার করে মেরে ফেলতে হয়।

সাপ দেখার জন্য অনেক লোক ভিড় করে এসেছে। বড়মামা নিজে একটা শাবল নিয়ে কাজের লোকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন গর্ত খোঁড়ায়। বড় মামার লম্বা-চওড়া চেহারা, যেমন জেদী, তেমনই সাহসী মানুষ। ছেলে-মেয়েরা কৌতূহল চাপতে না পেরে খুব কাছে চলে আসতেই বড়মামা ধমক দিয়ে বলছেন, এই, সর, সরে যা, সাপ দুটো লাফিয়ে উঠে এলে তখন আর পালাবার সময়ও পাবি না।

গর্ত খোঁড়া চলতেই লাগল, চলতেই লাগল, সাপের দেখা নেই। চতুর্দিকে অনেকগুলো গর্ত হয়ে গেল, তবু সাপেরা যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পাশেই একটা মজা পুকুর। পুকুরও ঠিক বলা যায় না, খানিকটা জলা জায়গা। নানারকম আগাছায় ভরা, বর্ষাকালেও এক হাঁটুর বেশি জল হয় না। খানিকটা দূরে একটা ভাঙা

শিবমন্দির। এক সময় হয়তো এখানে একটা সত্যিই পুকুর ছিল, এখন ভরাট হয়ে গেছে। এখন আশেপাশের বাড়ির লোক ওখানে নোংরা-ময়লা ফেলে। গাছ হয়ে গেছে। কতরকম।

বড়মামার ডাকনাম সোনা। একজন কাজের লোক বলল, ও সোনাভাই, সাপ দুটো যদি এই মজা-পুকুরে লুকোয়, খুঁজে পাবেন কী করে?

অন্য সবাইও সেই কথাই ভাবছে।

বড়মামা একটুক্ষণ কোমরে হাত দিয়ে চোখ কটমট করে তাকিয়ে রইলেন। যে সাপ তার দিকে ফোঁস করে ভয় দেখিয়েছে, তাকে তিনি ছাড়বেন না।

তিনি বললেন, সব জায়গাটাই খুঁড়ে ফ্যাল!

অতখানি জায়গা, ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে আরও কত গর্ত রয়েছে, খুঁড়ে ফেলা কি সোজাকথা?

বড়মামা বললেন, আরও দশজন লোক ঠিক কর। এই মজা-পুকুরটা আমি উদ্ধার। করব। এখানে নতুন পুকুর হবে। এ কাজ আমাদের আগেই করা উচিত ছিল। এখানে সিমেন্টের ঘাট বাঁধিয়ে দেব। দুপুরে এই পুকুরে চান করব, আর বিকেলে ঘাটে বসে চা খাব!

সাপ খুঁজতে খুঁজতে পুকুর।

পরদিন থেকে হই-হই, রই-রই কাণ্ড।

দশ-বারোজন লোক মিলে শুরু হল মাটি কাটা। যেন একটা উৎসব। ওরা আবার মাটি কাটতে-কাটতে গান গায়।

দেখতে-দেখতে কেমন বদলে গেল জায়গাটা।

কত কচু গাছ, আশশ্যাওড়া আর ভ্যারেণ্ডার ঝোঁপ-ঝাড় সাফ হয়ে গেল, চারধার ঢালু হয়ে তৈরি হতে লাগল পুকুর। কত দুর পালাল এদিক-ওদিক। সাপ কিন্তু দেখা গেল না, তারা নাকি চলে গেছে পাতালে। মিলিরা দিদিমার কাছে গল্প শুনেছে, পাতালে। আছে নাগরাজ্য, সেখানে সাপেরা থাকে। মহাভারতের ভীম একবার জলে ডুবে চলে গিয়েছিল সেই নাগরাজ্যে।

মাটি-কাটা লোকদের মধ্যে একজনের নাম ভুলু মিঞা, সে খুব কাজে ফাঁকি দেয়। মাঝে-মাঝেই বিড়ি খায় আর কাদামাটির মধ্যেই একটুখানি শুয়ে ঘুমিয়ে নেয়। সে-ই কিন্তু একটা দারুণ কাণ্ড করে ফেলল।

পুকুর খোঁড়র সাত দিনের দিন সে হঠাৎ এক সময় চেঁচিয়ে উঠল, সোনার কলসি! সোনার কলসি! গুপ্তধন পেয়ে গেছি রে!

সবাই কাজ ফেলে ছুটে এল।

যদিও কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না। একজন বলল, তুই কি আজ বিড়ির বদলে গাঁজা খেয়েছিস নাকি রে? কোথায় গুপ্তধন? নতুন পুকুরের জাগ্রত দৈত্য

ভুলু মিঞা দারুণ উত্তেজিত ভাবে বলল, আমি শাবল চালাই আর ঠং-ঠুং শব্দ হয়। সোনার কলসিতে লাগে। আমারে গুপ্তধনের ভাগ দিতে হবে কিন্তু!

তখন তিন-চারজন সেই জায়গাটায় শাবল আর কোদাল চালিয়ে দেখল, সত্যিই কী যেন একটা শক্ত জিনিসে লাগছে।

সবারই গুপ্তধনের কথা মনে হয়।

আগে এখানে পুকুর ছিল, শিবমন্দির ছিল, গুপ্তধন তো থাকতেই পারে। অনেকে যক্ষের ধনও পুঁতে রাখত এক সময়।

খবর পেয়ে বড়মামা ছুটে এলেন।

তিনি চারজনকে বেছে নিয়ে বললেন, ভালো করে, সাবধানে জিনিসটাকে খুঁড়ে তোলো। যদি গুপ্তধন থাকে, সবাই ভাগ পাবে।

ভুলু মিঞা বলল, আমি একটু বেশি পাব না?

অনেক চেষ্টায় যে জিনিসটা পাওয়া গেল, সেটা একটা দু-হাত লম্বা পাথর। জিনিসটা কী, তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে, সোনার কলসি মোটেই না।

বড়মামা ভুলু মিঞাকে জিগ্যেস করলেন, তুই সোনার কলসি কোথায় দেখলি রে?

ভুলু মিঞা চুপ। তার বন্ধু শিবু বলল, ও ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে।

পাথরটাকে ওপরে এনে অনেক করে ঘষে-ঘষে, জল দিয়ে ধোয়ার পর দেখা গেল, সেটা একটা পাথরের মূর্তি।

কোনও ঠাকুর-দেবতার মূর্তি ভেবে অনেকে মাটিতে কপাল ছুঁইয়ে প্রণাম করতে লাগল।

কিন্তু এটা আবার কী ঠাকুর। শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা হতেই পারে না। চেনা কোনও দেবতার মতনও নয়। দেখলে কেমন যেন ভয়-ভয় করে। মাথায় বাবড়ি চুল, মস্ত বড় চোখ, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, একটা হাত ভাঙা, আর একটা হাতে গদার মতন একটা কিছু।

দেখলে দেবতার বদলে দৈত্য কিংবা দানব বলে মনে হয়।

একটা কিছু যখন পাওয়া গেছে, তখন আরও অনেক কিছু পাওয়া যেতে পারে। আবার নতুন উদ্যমে শুরু হল খোঁড়াখুঁড়ি,। এরপর আরও কয়েকটা পাথরের টুকরো, সেগুলো এমনই ভাঙা যে কিছু বোঝাই যায় না, কয়েকটা ভাঙা মাটির হাঁড়ি, মানুষের হাড়,

ত্রিশূলের অংশ, এইসব উঠল। গুপ্তধন পাওয়া গেল না। তবে পাওয়া গেল কিছু পুরোনো আমলের তামার পয়সা, লোকে কিছু মানত করে জলে ছুঁড়ে ফেলত।

দশদিনের মধ্যে পুকুরের তলা থেকেও জল উঠতে লাগল, বৃষ্টিও নামল। ভরে গেল পুকুর, আর খোঁড়াখুঁড়ির প্রশ্নই রইল না।

বড়মামা সাঁতার কেটে এপার-ওপার করে এসে বললেন, রোজ সাঁতরাবো, বেশ ভালো ব্যায়াম হবে।

ছোটমামা বলল, এবার পুকুরে মাছ ছাড়তে হবে। তারপর আমি ছিপ ফেলে মাছ ধরব।

বড়মামা বললেন, মাছ ধরাও শিখতে হয়। নইলে তোর অবস্থা হবে, ছিপ নিয়ে গেল কোলাব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে!

আশেপাশের অনেক বাড়ির লোক পুকুরটায় স্নান করতে আসে। সবাই খুশি হয়ে ধন্য ধন্য করে বড়মামাকে। কাছাকাছি আর কোনও ভালো পুকুর নেই।

পাথরের মূর্তিটাকে নিয়ে এখন কী করা হবে?

ঠাকুর-দেবতার মূর্তি হলে পুজো করা উচিত। কিন্তু কোন ঠাকুর বোঝা না গেলে পুজো হবে কী করে? আর দৈত্য-দানব হলে তো পুজো করাটাই খারাপ।

সেটাকে পরিষ্কার করে, তেল-টেল মাখিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে বৈঠকখানার এক কোণে।

অনেক দেখতে এসে নানা কথা বলে।

কেউ বলে, এটা যক্ষ। কেউ বলে, বীরভদ্র। কেউ বলে, স্বর্গের দ্বারপাল। আবার কেউ বলে, আগেকার কোনও রাজার মূর্তি হতে পারে।

স্কুলের হেডমাস্টার করিম সাহেব অনেক কিছু জানেন।

তিনি একদিন এসে অনেকক্ষণ ধরে দেখে বড়মামাকে বললেন, সোনাবাবু, আগে পরীক্ষা করে দেখা দরকার, এটা কত দিনের পুরোনো। যদি পাঁচ-ছশো বছরের পুরোনোও হয়, তা হলে মূর্তিটা যারই হোক, তা ইতিহাসের সম্পদ। কোনও প্রাচীন মূর্তি মাটির তলা থেকে পাওয়া গেলে, তা কারুর বাড়িতে রাখার নিয়ম নেই। গভর্নমেন্টকে জানাতে হয়, গভর্নমেন্ট মিউজিয়ামে রাখে।

বড়মামা বললেন, কত দিনের পুরোনো, তা বুঝব কী করে?

করিম সাহেব বললেন, সরকারের লোকদের খবর দিতে হবে। তারা এসে দেখে যাবে।

করিম সাহেব শনিবার দিন সিউড়ি যাবেন, তিনি নিজেই খবর দিয়ে আসবেন। এর মধ্যে করিম সাহেব জ্বরে পড়ে গেলেন, তার আর সিউড়ি যাওয়া হল না।

মিলি যতবার বৈঠকখানা ঘর দিয়ে যায়, মূর্তিটার দিকে একবার তাকায়। ভয়ে তার বুক ছমছম করে।

তার যেন মনে হয়, মূর্তিটা রেগেমেগে তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

এমনি পাথরের মূর্তি, কিন্তু সন্ধেবেলা অন্ধকারে মনে হয় যেন,তার গা থেকে একটু-একটু আলো ফুটে বেরুচ্ছে।

শুধু মিলিরই এরকম মনে হয়। আর কেউ ভয় পায় না, আলোও দেখতে পায় না।

একদিন বিকেলবেলা মিলি সবেমাত্র স্কুল থেকে ফিরেছে, বৈঠকখানায় বইয়ের ব্যাগটা রাখতেই সেই মূর্তিটা যেন স্পষ্ট গম্ভীর গলায় ডেকে উঠল, এই মিলি, মিলি।

মিলি সঙ্গে-সঙ্গে চোখ খুঁজে দৌড়।

ওদিকের বারান্দায় দিদিমাকে দেখেই তাকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠল।

প্রথমে সে কিছু বলতেই চায় না। তারপর বড়মামা এসে বারবার জিগ্যেস করতে লাগলেন, কী হয়েছে, বল? কী হয়েছে?

মিলির বাবা-মা থাকেন দিল্লিতে। সে মামাবাড়িতে থেকে পড়াশুনো করছে। সে এ বাড়ির খুব আদরের।

শেষপর্যন্ত আসল কথাটা শুনে বড়মামা হো-হো করে হেসে উঠলেন। মিলির মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, ওরে, পাথরের মূর্তি কোনওদিন কথা বলতে পারে না। ওদের তো ফুসফুস নেই। গলার মধ্যে নল নেই।

মিলিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন বৈঠকখানায়।

মূর্তিটার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, এই দ্যাখ, সলিড পাথর। মুখই নেই, কথা বলবে কী করে?

মিলি এখন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে। সে আঙুল তুলে বলল, ওই দ্যাখো।

সেই পাথরের মূর্তিটার কাছেই রাখা ছিল একটা বাঁকুড়ার ঘোড়া। এখন সেটা উলটে পড়ে আছে মাটিতে।

কী করে পড়ল? মূর্তিটাই ধাক্কা দিয়ে ঘোড়াটাকে ফেলে দিয়েছে।

বড়মামা বললেন, এইবার বোঝা গেল। একে বলে কাকতালীয়। ঘোড়াটা পড়ে যাওয়ার শব্দ হয়েছে, তাতেই তোর মনে হয়েছে পাথরের মূর্তিটা কথা বলেছে।

ঘোড়াটা পড়ল কী করে? এমনি-এমনি?

ঘোড়াটা ঠিক মতন দাঁড়াতে পারে না, টিকটিক করে। এর আগেও আরও দুবার পড়ে গিয়েছিল। দেখছিস না, একটা কান ভাঙা।

মিলির তবু বিশ্বাস হয় না।

আরও অনেকে এসেছে এ ঘরে। ছোটমামা মজা করে বলল, না বড়দা, মূর্তিটা বোধহয় সত্যিই মিলিকে ডেকেছে। রাক্ষসটার খিদে পেয়েছে বোধহয়।

বড়মামার ছেলে পিন্টু আরও দুষ্টু। সে বলল, না, না, রাক্ষস কেন হবে, ওটা তো রাজা নরসিংহদেবের মূর্তি। রাজার পছন্দ হয়েছে মিলিকে। সেই যে ছড়া আছে না, এলাটিং বেলাটিং সইলো, রাজা একটি বালিকা চাইল। কোনও বালিকা চাইল? মিলি সেনগুপ্তকে চাইল–

মিলি ছুটে চলে গেল সে ঘর থেকে।

তারপর থেকে মিলি ঠিক করেছে, সে আর একা কখনো বৈঠকখানা ঘরে ঢুকবে । অন্যদের সঙ্গে এলেও মূর্তিটার দিকে চাইবে না। তবু চোখ চলে যায়। মনে হয় যেন সে আরও রেগে গেছে।

করিম সাহেবের জ্বর হয়েছে, তিনি সিউড়িতে খবর দিয়ে এসেছেন।

দু-একদিনের মধ্যেই সরকারি লোক এসে পড়বে।

তার মধ্যেই একটা কাণ্ড হল।

দিদিমার খুব পাতলা ঘুম। রাত্তিরে খুটখাট শব্দ হলেই তিনি জেগে ওঠেন।

মাঝরাত্তিরে তিনি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, কে রে? কে রে?

ছোট মামা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশুনো করে ছাদের ঘরে। মায়ের গলা শুনে সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়াল পাঁচিলের কাছে।

দেখতে পেল, বৈঠকখানা ঘর থেকে কে একটা লোক বেরিয়ে এসে দৌড়োচ্ছে।

ছোটমামা চেঁচিয়ে উঠল, চোর, চোর! বড়দা, পিন্টু, হারান, ওঠ, চোর পালাচ্ছে।

চোরটা ছুটছে, কিন্তু সোজাসুজি নয়। কেমন যেন এঁকেবেঁকে, যেন সে টলে টলে পড়ে যাচ্ছে একবার রাস্তার এদিকে, আর একবার ওদিকে।

সবাই বেরিয়ে তাড়া করে যেতেই চোরটা ঝাঁপ দিল পুকুরে।

তারপর সে নিজেই আর্তচিৎকার করে উঠল, বাঁচাও, বাঁচাও, আমারে সুষ্ঠু নিয়ে টানছে গো, মরি যাব, মরি যাব।

বড় টর্চের আলোয় দেখা গেল গভীর জলে খাবি খাচ্ছে চোরটা। সাঁতার না জেনে সে চুরি করতে এসেছে? পুকুরে ঝাঁপ দিল কেন?

বড়-মামা নিজেই সাঁতরে গিয়ে চোরটাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন।

তখন আর এক বিস্ময়।

এ চোর তো চেনা, সেই ভুলু মিঞা।

সে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, আমার কোনও দোষ নাই সোনাভাই, সে আমাকে টেনে এনেছে। নিজে আসি নাই। আমি বাপের জন্মে কখনো কিছু চুরি করি নাই। সে টেনে আনল জোর করে।

সে মানে কে? কে টেনে আনল?

ওই দানবটা! ওই ব্রহ্মদৈত্য।

কোনওরকমে ভুলু মিঞাকে শান্ত করার পর যা বোঝা গেল, তার কোনও মাথামুন্ডু নেই। ওই মূর্তিটা নাকি রোজই তাকে স্বপ্নে দেখা দেয়। ভয় দেখায়। আজ সে স্বপ্নে এসে বলল, কেন তুই আমাকে মাটির তলা থেকে তুলে আনলি? যেখান থেকে এনেছিলি, সেখানে

রেখে আয়। নইলে তোর সর্বনাশ করব, তোর বউ-ছেলে-মেয়ে বাঁচবে না। তাই তো আমি দৌড়ে এসেছি ওঁকে পানিতে ফেলে দিতে। কিন্তু এমন নিমকহারাম, আমারেও টানছিল, আমারেও পানির নিচে নিয়ে মেরে ফেলতে চাইছিল গো! সোনাভাই আমাকে বাঁচালেন।

গরম দুধ খাইয়ে শান্ত করা হল ভুলু মিঞাকে। আর কিছু নয়, শুধু ওই পাথরের মূর্তিটাই সে চুরি করতে আসবে কেন? সাঁতার না জেনে কি কেউ জলে ঝাঁপ দেয়?

কিন্তু একটা পাথরের মূর্তিকে কেউ স্বপ্নে দেখলেও সেই মূর্তি কি ভয় দেখাতে পারে?

ছোটমামা বলল, পারবে না কেন? বেশি গাঁজা খেলেই ওরকম হয়।

পিন্টু বলল, স্বপ্ন-টপ্ন বাজে কথা। কারুর কাছ থেকে বোধহয় শুনেছে যে পুরোনো আমলের মূর্তির অনেক দাম হয়। তাই চুরি করে বেচতে চেয়েছিল।

কিন্তু পরদিন সকাল থেকে ভুলু মিয়া তার স্বপ্নের কথাই বলে বেড়াতে লাগল। সবাই বিশ্বাস করল তার কথা। সবাই ধরে নিল, দেবতা নয়, মূর্তিটা কোনও দৈত্যেরই। এবং জাগ্রত দৈত্য।

সরকারি লোকেরা আসার পর কেউ আর পুকুরে ডুব দিয়ে সে মূর্তি তুলতে রাজি হল না। সরকারি লোকেরাও আর বেশি আগ্রহ না দেখিয়ে ফিরে গেল।

এখন যারা পুকুরে স্নান করে, তারা জলে নামবার আগে একবার জাগ্রত দৈত্যের উদ্দেশে প্রণাম করে। সে অবশ্য কোনওদিন কারুর পা ধরে টানেনি।